শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমীন (রহ.)
উলামার মতানৈক্য
ও
আমাদের কর্তব্য
Islamicalo.com

উলামার মতানৈক্য
ও
আমাদের কর্তব্য

প্রণয়নে :
ফযীলাতুশ শায়খ মুহাম্মাদ বিন সালেহ আল-উষাইমীন (রঃ)
ভাষান্তরে :
আব্দুল হামীদ ফাইযী আল-মাদানী
বিশিষ্ট আন্তর্জাতিক ইসলামী গবেষক, লেখক, মুহাক্কিক আলিম ও দাঈ

প্রকাশনায়
তাওহীদ পাবলিকেশন্স
ঢাকা-বাংলাদেশ

উলামার মতানৈক্য ও আমাদের কর্তব্য

ফযীলাতুশ শায়খ মুহাম্মাদ বিন সালেহ আল-উষাইমীন (রঃ)
অনুবাদ : আবদুল হামীদ ফাইযী আল-মাদানী

বই নং ২০

বাংলাদেশ সংস্করণ :
প্রথম প্রকাশ : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বই মেলা, ফেব্রুয়ারী ২০১১ ঈসায়ী

প্রকাশনায় :
তাওহীদ প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স
৯০, হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা-১১০০
ফোন : 7112762, 01190368272, 01711646396, 01919646396
ইমেইল : tawheedpp@gmail.com,
ওয়েব : www.tawheedpublications.com

প্রচ্ছদ : আল-মাসরুর

ISBN : 978-984-8766-44-0

মুদ্রণ :
হেরা প্রিন্টার্স.
হেমন্দ্র দাস লেন, ঢাকা

ভূমিকা ৪
গোড়ার কথা ৮
মতানৈক্যের প্রথম কারণ ১১
দ্বিতীয় উদাহরণ---------১৩
মতানৈক্যের দ্বিতীয় কারণ ১৫
মতানৈক্যের তৃতীয় কারণ ১৭
মতানৈক্যের চতুর্থ কারণ ২০
মতানৈক্যের পঞ্চম কারণ ২০
মতানৈক্যের ষষ্ঠ কারণ ২৩
আমাদের কর্তব্য ২৫
পরিশিষ্ট ২৯

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

إِنَّ الْحَمْدَ للهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلاَ هَادِىَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُه. ﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ ﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴾ ﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَقُولُوا۟ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَـٰلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾ ﴾ وبعد:

মতভেদ মানুষের এক প্রকৃতি। কোন এক বিষয়কে পছন্দ-অপছন্দ নিয়ে দ্বিমত হওয়া স্বাভাবিক। রং নিয়ে, স্বাদ নিয়ে, গন্ধ নিয়ে এক এক মানুষের ভালো লাগা- না লাগার ব্যাপারে এক এক মত, এক এক ভিন্ন ভিন্ন পছন্দ। মানুষের প্রায় সকল ব্যাপারেই মতভেদ অস্বাভাবিক কিছু নয়। এক ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্র ও চিকিৎসা অন্য ডাক্তারের সাথে মিল খায় না। এক প্রকৌশলীর প্রকৌশল অন্য প্রকৌশলীর সাথে খাপ খায় না। সুতরাং শরীয়তের বিষয়াবলীতেও অনুরূপ দ্বিমত থাকা অস্বাভাবিক নয়, বরং তা স্বাভাবিক। তাই কোন বিষয়ে মতভেদ শুনে আশ্চর্য হওয়ার এবং আক্ষেপ করার কিছু নেই। বরং জানতে হবে এটাই তো প্রকৃতি।

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَٰحِدَةً ۖ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ﴿١١٨﴾ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ۚ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ ۗ ﴾

অর্থাৎ, তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করলে সমস্ত মানুষকে এক জাতি করতে পারতেন, কিন্তু তারা মতভেদ করতেই থাকবে। তবে ওরা নয় যাদের প্রতি তোমার প্রতিপালক দয়া করেন। আর তিনি তাদেরকে এই জন্যই সৃষ্টি করেছেন। *(সূরাহ হূদ ১১৮-১১৯ আয়াত)*

তবে মতভেদ যে রহমত তা নয়। এ বিষয়ে উল্লেখ্য হাদীসটি সহীহ নয়, বরং তা জাল।[১]

পক্ষান্তরে হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'মতভেদ হল মন্দ জিনিস।'[২]

মতভেদ স্বাভাবিক হলেও সে নিয়ে বাড়াবাড়ি করা, হক জানার পর তা প্রত্যাখ্যান করা বা তার দিকে প্রত্যাবর্তন না করা, বরং তা নিয়ে কলহ-বিবাদ তথা লাঠালাঠি ও যুদ্ধ করা অবশ্যই বাঞ্ছিত নয়। কিন্তু এই অবাঞ্ছিত ঘটমান-বর্তমানের ফলেই সাধারণ মানুষের মনে প্রশ্ন, আমাদের আল্লাহ এক, নবী এক, কিতাব এক, কিবলাহ এক তবে মতভেদ কিসের ও কেন? কেন উলামাগণ একমত নন? কেন এত মযহাব ও ফির্কাহবন্দী তথা দলাদলি?

এ সকল প্রশ্নের কিছু কিছু উত্তর দেওয়া হয়েছে অত্র পুস্তিকায়। মতানৈক্যের বিভিন্ন কারণ বলার পর নির্দেশ করা হয়েছে যে, নির্দিষ্ট কোন মযহাবের তাকলীদ নয়, নির্দিষ্ট কোন দলের দলীয় নীতি বা মতবাদের অনুসরণ নয়, নির্দিষ্ট কোন ইমাম বা আলেমের অন্ধ অনুকরণ নয়, বরং মুসলিমের উচিত, সহীহ দলীলের অনুসরণ করা। কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর অন্ধানুকরণই মুসলিমের একমাত্র নাজাতের পথ।

একই বিষয়ে বহুমত থাকলে সেই মতকে গ্রহণ করা উচিত, যা সহীহ দলীল ভিত্তিক এবং বলিষ্ঠ। কক্ষণই সে মত গ্রহণ করা উচিত নয়, যা নিজের মনঃপূত ও যাতে নিজের স্বার্থ রক্ষা হয়। কার মত গ্রহণ করা হবে তা নিয়েও নিজের বিবেক-বিবেচনাকে কাজে লাগাতে হবে। কোন্ আলেম ইল্ম ও আমলে বড় তা নির্বাচন করতে হবে সুস্থ মন-মস্তিষ্কের মাপকাঠিতে। মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেন, "তুমি তোমার হৃদয়ের কাছে ফতোয়া নাও, যদিও মুফতীরা তোমাকে ফতোয়া দিয়েছে।"[৩]

তবে হ্যাঁ সতর্কতার বিষয় যে, বড় আলেম চেনা বড় পাগড়ী, লম্বা নামায বা লম্বা জামা দেখে অথবা সুন্দর হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা শুনে সম্ভব নয়।

---

[১] *(সিলসিলাহ যয়ীফাহ ৫৭নং, সহীহুল জামে' ২৩০ নং)*

[২] *(আবূ দাঊদ, আহমাদ ৫/১৫৫, সিলসিলাহ সহীহাহ ১/১/৪৪৪)*

[৩] *(আহমাদ, দারেমী, সহীহুল জামে' ৯৪৮ নং)*

কারণ, কারো এ সবের আড়ম্বর থাকলেই যে তাঁর সহীহ ইল্ম থাকবে তা জরুরী নয়। তবে 'হক' হল মানিকের মত। মানিক যেখানেই পড়ে থাকুক না কেন, সেখান হতেই কুড়িয়ে নেওয়া জ্ঞানীর কর্তব্য।

আর একটি সতর্কতার বিষয় এই যে, ইখতিলাফ ও তানবী' (মতভেদ ও প্রকারভেদ) এক জিনিস নয়। বহু আমল আছে যা ১, ২, ৩, ৪ বা ততোধিক রকমভাবে করলেও চলে। বরং কখনো এ রকম কখনো ঐ রকমভাবে আমল করাই সুন্নত। তা কিন্তু আসলে মতভেদের কারণে নয়। বরং তা উম্মাহর জন্য সহজ করার লক্ষ্যে শরীয়ত মৌলিকভাবেই এমন একাধিক প্রকারের পদ্ধতি বিধিবদ্ধ করেছে। আসলে এই তানবী' (আমলের প্রকারভেদ)ই হল উম্মতের জন্য রহমত স্বরূপ।

সাহাবী গুযাইফ বিন হারেস বলেন, একদা আমি আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, 'আল্লাহর রসূল ﷺ প্রথম রাতে নাপাকীর গোসল করতেন, নাকি শেষ রাতে?' তিনি প্রত্যুত্তরে বললেন, 'কোন রাতে তিনি প্রথম ভাগে গোসল করতেন, আবার কোন কোন রাতে শেষ ভাগে।' আমি বললাম, 'আল্লাহু আকবার! সেই আল্লাহর প্রশংসা যিনি (দ্বীনের) ব্যাপারে প্রশস্ততা রেখেছেন।' অতঃপর আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'তিনি বিতরের নামায প্রথম রাত্রিতে পড়তেন, নাকি শেষ রাত্রিতে?' তিনি বললেন, 'কখনো তিনি প্রথম রাত্রিতে বিত্র পড়তেন, আবার কখনো শেষ রাত্রিতে।' আমি বললাম, 'আল্লাহু আকবার! সেই আল্লাহর প্রশংসা যিনি (দ্বীনের) ব্যাপারে প্রশস্ততা রেখেছেন।' পুনরায় আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'তিনি (তাহাজ্জুদের নামাযে) সশব্দে ক্বিরাআত পড়তেন, নাকি নিঃশব্দে?' উত্তরে তিনি বললেন, 'তিনি কখনো সশব্দে পড়তেন, আবার কখনো নিঃশব্দে।' আমি বললাম, 'আল্লাহু আকবার! সেই আল্লাহর প্রশংসা যিনি (দ্বীনের) ব্যাপারে প্রশস্ততা রেখেছেন।'[৪]

বলা বাহুল্য, উভয় প্রকার মতভেদের মাঝে তালগোল খাইয়ে বিমূঢ় হওয়া চলবে না। বরং কর্তব্য কি তা নির্ণয় করে আমল করতে হবে।

এই পুস্তিকাটি সেই সকল মানুষদের জন্য বড় উপকারী মনে করি, যাঁরা মতভেদের গোলক-ধাঁধায় পড়ে উলামাদের প্রতি কটুক্তি প্রয়োগ করে থাকেন অথবা আমলকেই হাল্কা ভেবে বসেন অথবা মনে করেন, সবই ঠিক; তবে 'চার মযহাবের মধ্যে এক মযহাবের তাকলীদ করা ফরয!'

উক্ত উপকারের কথা মাথায় রেখেই সঊদী আরব তথা সারা বিশ্বের এক

---

[৪] *(মুসলিম, সহীহ আবূ দাউদ ২০৯, ইবনে মাজাহ, মিশকাত ১২৬৩নং)*

বড় ফকীহ ও রব্বানী আলেম ***ফযীলাতুশ শায়খ মুহাম্মাদ বিন সালেহ আল-উসাইমীন*** (রঃ)-এর প্রণীত এই বিশাল উপকারী ও ক্ষুদ্র পুস্তিকাটি অনুবাদ করতে প্রয়াস পেয়েছি। মহান আল্লাহর কাছে এই আশা ও কামনা যে, তিনি যেন শায়খকে বেহেশ্তের সুউচ্চ স্থানে স্থান দেন এবং আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রয়াসকে আমাদের নেকীর পাল্লায় রাখেন।

বিনীতঃ

৫/৭/১৪২২হিঃ *আব্দুল হামীদ মাদানী*

আল-মাজমাআহ, সউদী আরব

গোড়ার কথা

মাসনূন খুতবার পর, পুস্তিকার শিরোনাম পড়ে অনেক পাঠকের মনে এমন প্রশ্ন উঠতে পারে যে, দ্বীনের অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বহু বিষয় থাকতে লিখার বিষয়বস্তু তা হল কেন?

বাস্তবপক্ষে এ বিষয়টি বিশেষ করে বর্তমানকালে বহু মানুষের মন ও মগজকে মশগুল করে রেখেছে। আমি সাধারণ মানুষের কথাই বলছি না, বরং উলামাদের অবস্থাও অনুরূপ। আর তার কারণ হল এই যে, প্রচার-মাধ্যম (পত্র-পত্রিকা, রেডিও-টিভি) গুলিতে খুব বেশী বেশী করে দ্বীনের হুকুম-আহকাম সম্প্রচারিত হচ্ছে। এতে 'এঁর-ওঁর' বয়ান ও কথার মাঝে মতানৈক্য জনসাধারণের জন্য বিভ্রান্তিকর। বরং অনেক মানুষের কাছে তা সন্দেহের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে; বিশেষ করে তাদের কাছে, যারা মতানৈক্যের উৎস ও কারণ বুঝে না।

আর এ জন্যই -আল্লাহর কাছে সাহায্য ভিক্ষা করে- এ বিষয়টিকে আমার আলোচ্য-বস্তুরূপে গ্রহণ করে নিতে প্রয়াস পেয়েছি; যে বিষয়টি -আমার দৃষ্টিতে- মুসলিমদের নিকট একটি মহা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

এই উম্মতের উপর মহান আল্লাহর অন্যতম নেয়ামত এই যে, দ্বীনের মৌলিক বিষয় এবং তার মূল উৎসতে (আহলে সুন্নাহর মাঝে) কোন প্রকার মতভেদ সৃষ্টি হয়নি। বরং মতভেদ ঘটেছে এমন বিষয়সমূহে, যার ফলে মুসলিমদের প্রকৃত ঐক্য ও সংহতিতে কোন আঁচড় লাগে না। আর এমন মতভেদ হওয়াটাই স্বাভাবিক ছিল, যা থেকে বাঁচার উপায় ছিল না।

এখন যে বিষয়ে আলোচনায় লিপ্ত হতে চলেছি তা নিম্নরূপ ঃ-

আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রসূল ﷺ-এর সুন্নাহ থেকে লব্ধ জ্ঞানে এ কথা সকল মুসলিমদের কাছে বিদিত যে, মহান আল্লাহ মুহাম্মাদ ﷺ-কে হেদায়াত ও সত্য দ্বীন দিয়ে প্রেরণ করেছেন। আর এ থেকে ব্যাপকভাবে এ কথা বুঝা যায় যে, আল্লাহর রসূল ﷺ এ দ্বীনকে যথেষ্ট সন্তোষজনকভাবে এমন ব্যাখ্যা করে গেছেন, যার পরে আর কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। কারণ, হেদায়াত তার শাব্দিক অর্থে গোমরাহীর সার্বিক অর্থের পরিপন্থী। যেমন সত্য দ্বীন -তার শাব্দিক অর্থে সেই সকল অসত্য ও বাতিল দ্বীনের পরিপন্থী,যা মহান আল্লাহর মনোনীত ও পছন্দ নয়।

আল্লাহর রসূল ﷺ হেদায়াত ও সত্য দ্বীন সহ প্রেরিত হয়েছিলেন।

লোকেরা তাঁর আমলে মতানৈক্য ও কলহের সময় তাঁর প্রতি রুজু করতেন। তিনি তাদের মাঝে মীমাংসা ও ফায়সালা করে দিতেন এবং তাদের জন্য হক ও সঠিকতা বিবৃত করতেন। তাদের মতবিরোধ কখনো আল্লাহর কালাম বুঝা নিয়ে হত। অথবা আল্লাহর আহকামের মধ্যে এমন কোন হুকুম নিয়ে হত, যার নির্দেশ তখনও অবতীর্ণ হয় নি।অতঃপর কুরআন তার বিবরণ নিয়ে নাযিল হত। আর এ জন্যই আমরা কুরআনের বহু জায়গায় পড়ে থাকি,

﴿ يَسْأَلُوْنَكَ عَنْ ..... ﴾

অর্থাৎ, লোকেরা তোমাকে (অমুক প্রসঙ্গে) জিজ্ঞাসা করে---।

অতঃপর মহান আল্লাহ সেই জিজ্ঞাসার সন্তোষজনক উত্তর প্রদান করতেন এবং তা মানুষের মাঝে পৌঁছে দিতে তাঁর নবী ﷺ কে আদেশ দিতেন। যেমন মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ يَسْـَٔلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمْ ۖ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَٰتُ ﴾

অর্থাৎ, লোকেরা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, তাদের জন্য কি কি বৈধ করা হয়েছে? বল, সমস্ত ভাল জিনিস তোমাদের জন্য বৈধ করা হয়েছে।
(সূরাহ মাইদাহ ৪ আয়াত)

﴿ وَيَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ ﴾

অর্থাৎ, লোকেরা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, তারা কি খরচ করবে? বল, যা উদ্বৃত্ত। *(সূরাহ বাক্বারাহ ২১৯ আয়াত)*

﴿ يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ الْأَنفَالِ ۖ قُلِ الْأَنفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾

অর্থাৎ, লোকেরা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সম্বন্ধে। বল, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আল্লাহ এবং রসূলের। *(সূরাহ আনফাল ১ আয়াত)*

﴿ يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ ۖ قُلْ هِىَ مَوَٰقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۗ ﴾

অর্থাৎ, লোকেরা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে নতুন চাঁদ সম্বন্ধে। বল, উহা লোকেদের (কাজ-কারবারের) এবং হজ্জের জন্য সময় নির্দেশক। *(সূরাহ বাক্বারাহ ১৮৯ আয়াত)*

﴿ يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ۖ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ۖ ﴾

অর্থাৎ, লোকেরা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে হারাম (নিষিদ্ধ ও পবিত্র) মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে। বল, সে সময় যুদ্ধ করা ভীষণ অন্যায়। *(ঐ ২১৭ আয়াত)*

এ ছাড়া আরো অন্যান্য আয়াত রয়েছে, যা অনেকেরই জানা।

কিন্তু রসূল ﷺ-এর ইন্তিকালের পর তাঁর উম্মত শরীয়তের সেই আহকাম নিয়ে মতভেদ করতে লাগল, যা শরীয়তের মৌলিক নীতিমালা ও উৎসকে আঘাত করে না। যে সকল মতবিরোধ দেখা দিল তার কিছু কারণ আমি বর্ণনা করব ইন শাআল্লাহ।

আমরা সকলেই একথা দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে জানি যে, ইল্‌ম, আমানত ও দ্বীনদারীতে বিশ্বস্ত উলামাবৃন্দের কেউই ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রসূলের সুন্নাহর বিরোধিতা করতে পারেন না। যেহেতু যিনি ইল্‌ম ও দ্বীনদারীর ভূষণে ভূষিত হবেন, আবশ্যকীয়ভাবে তাঁর রাহবার (পথপ্রদর্শক) হবে হক। আর যাঁর রাহবার হক হবে, আল্লাহ তাঁর জন্য (সমস্যার সমাধানের পথ) সহজ করে দেবেন। মহান আল্লাহ কি বলেন শুনুন,

﴿ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ۝١٧ ﴾

অর্থাৎ, উপদেশ গ্রহণের জন্য আমি কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি। অতএব কেউ উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি? *(সূরাহ ক্বামার ১৭ আয়াত)*

﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ ۝٥ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ ۝٦ فَسَنُيَسِّرُهُۥ لِلْيُسْرَىٰ ۝٧ ﴾

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি দান করে ও তাকওয়া অবলম্বন করে এবং যা উত্তম বিষয়কে সত্য বলে মেনে নেয়, আমি তার সুখদ পরিণামের পথ সহজ করে দিই। *(সূরাহ লাইল ৫-৭ আয়াত)*

কিন্তু উক্ত প্রকার ইমামগণ দ্বারাও মহান আল্লাহর আহকামে ভুল ঘটে যেতে পারে। অবশ্য ঐ মৌলিক কোন বিষয়কে কেন্দ্র করে নয়, যার ইঙ্গিত ইতিপূর্বে দেওয়া হয়েছে। বরং সে ভুল এমন পর্যায়ের হবে, যা মানুষের দ্বারা ঘটা স্বাভাবিক। কারণ, মানুষ হল দুর্বল-প্রকৃতির; যেমন মহান আল্লাহ নিজেই তার বর্ণনা দিয়ে বলেছেন,

﴿ وَخُلِقَ الْإِنسَـٰنُ ضَعِيفًا ۝٢٨ ﴾

অর্থাৎ, মানুষ সৃষ্টিগতভাবেই দুর্বল। *(সূরাহ নিসা ২৮ আয়াত)*

সুতরাং মানুষ তার জ্ঞান-বুদ্ধিতে দুর্বল। দুর্বল তার উপলব্ধি ও বোধশক্তিতে। আর এ জন্যই কোন কোন বিষয়ে তার ভুল ঘটে যাওয়া অবশ্যম্ভাবী। পরন্তু ভুল হওয়ার কারণগুলোও বড় বড় এবং এত বেশী যে, তা যেন কুলহীন সমুদ্র। অবশ্য অভিজ্ঞ (আলেম) মানুষ আহলে ইল্‌ম (বড় বড় উলামায়ে কেরাম)গণের উক্তির মাধ্যমে মতভেদের প্রচলিত বিভিন্ন কারণসমূহ সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করতে পারে।

আমরা এখানে যে সব কারণ উল্লেখ করার ইচ্ছা করেছি, তাই সংক্ষেপে বর্ণনা করব।

মতানৈক্যের প্রথম কারণ

যিনি ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে মতভেদ করছেন তাঁর নিকট দলীল পৌঁছেনি। অথবা দলীল পৌঁছেছে, কিন্তু যে পথে পৌঁছেছে তা তাঁর নিকট সন্তোষজনক নয়। মতানৈক্যের এই কারণটি সাহাবা ﷺ গণের পরবর্তী কালের উলামাদের জন্য নির্দিষ্ট নয়। বরং এটি সাহাবা ﷺ দের মাঝে এবং তাঁর পরবর্তীদের মাঝেও পাওয়া যেতে পারে। এখানে দু'টি উদাহরণ উল্লেখ করব, যা থেকে বুঝা যাবে যে, সাহাবা ﷺ গণের মাঝে উক্ত কারণ-ঘটিত মতানৈক্য সংঘটিত হয়েছিল।

প্রথম উদাহরণ ঃ ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীর কাছে দলীল পৌঁছেনি।

সহীহ বুখারী প্রভৃতি গ্রন্থে এ ঘটনা প্রমাণিত বলে আমরা জানি যে, আমীরুল মু'মেনীন উমার বিন খাত্তাব (رضي الله عنه) যখন শাম সফরে বের হলেন, তখন পথিমধ্যে খবর পেলেন যে, শামে প্লেগ রোগ বিস্তার লাভ করেছে। তিনি থেমে গিয়ে সাহাবাগণের সঙ্গে পরামর্শ করতে লাগলেন। (এ মত অবস্থায় শাম প্রবেশ করা উচিত হবে কি না? কারণ সে ব্যাধি হল সংক্রামক ও ছোঁয়াচে।) তিনি মুহাজির ও আনসারদের সাথে পরামর্শ করলেন। এতে তাঁরা দু'টি রায় দিয়ে পৃথক পৃথক মত প্রকাশ করলেন। (একদল বললেন, ফিরে যাওয়া হোক। জেনেশুনে রোগের মুখে পড়া উচিত নয়। অপর দল বললেন, শাম প্রবেশ করা হোক। কারণ, যা হবার তা হবেই। ভয় করার কিছু নেই। আল্লাহর তকদীর থেকে পলায়ন করার পথ নেই।) কিন্তু এ ক্ষেত্রে ফিরে যাওয়াটাই ছিল অধিক যুক্তিযুক্ত।

উক্ত রায় আদান-প্রদান ও পরামর্শ-আলোচনা চলাকালে আব্দুর রহমান বিন আউফ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এসে উপস্থিত হলেন। তিনি নিজ কোন প্রয়োজনে এতক্ষণ সেখানে হাজির ছিলেন না। তিনি বললেন, এ ব্যাপারে ইল্‌ম আমার কাছে আছে। আমি আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি; তিনি বলেছেন, "কোন স্থানে তা (প্লেগরোগ) চলছে শুনলে সেখানে যেও না। আর সেখানে তোমাদের থাকাকালে তা শুরু হলে সেখান হতে তার ভয়ে পলায়ন করো না।"[৫]

সুতরাং উক্ত সিদ্ধান্ত মুহাজির ও আনসারদের বড় বড় সাহাবার নিকটেও অবিদিত ছিল। শেষ অবধি আব্দুর রহমান বিন আউফ এসে তাঁদেরকে এ হাদীস শুনিয়ে সঠিক সিদ্ধান্তের কথা জ্ঞাপন করলেন।

আরো একটি উদাহরণ ঃ-

আলী বিন আবী তালেব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ও আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর রায় ছিল যে, গর্ভবতী মহিলার স্বামী মারা গেলে ৪ মাস ১০ দিন ও গর্ভকাল সময়ের মধ্যে যে সময়টি লম্বা হবে সেই সময়কাল ধরে সে (ইদ্দত) শোকপালন করবে। অর্থাৎ, স্বামী মারা যাওয়ার পর সে যদি ৪ মাস ১০ দিনের আগে আগেই প্রসব করে, তাহলে তার ইদ্দত শেষ হবে না। বরং তাকে ৪ মাস ১০ দিনই ইদ্দত পালন করতে হবে। অনুরূপ ৪ মাস ১০ দিন অতিবাহিত হওয়ার পরেও যদি সে গর্ভ অবস্থায় থাকে, তাহলে প্রসবকাল পর্যন্ত তাকে ইদ্দতে থাকতে হবে। কারণ, মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَأُوْلَٰتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾

অর্থাৎ, আর গর্ভবতী নারীদের ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত। *(সূরাহ ত্বালাক ৪ আয়াত)*

﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মারা যায়, তাদের স্ত্রীগণ ৪ মাস ১০ দিন অপেক্ষা করবে। *(সূরাহ বাক্বারাহ ২৩৪ আয়াত)*

---

[৫] *(বুখারী ও মুসলিম, সহীহুল জামে' ৬১৬-৬১৭নং)*

উল্লেখিত আয়াতদ্বয়ের মাঝে 'আম-খাস অজহী'র[৬] সম্বন্ধ রয়েছে। সুতরাং উভয় দলীলের মাঝে উক্ত সম্বন্ধ থাকলে এমনভাবে উভয় দলীলের নির্দেশ মান্য করতে হবে, যাতে উভয় দলীলের মাঝে সমন্বয় বজায় থাকে। আর উভয়ের মাঝে সমন্বয় সাধনের একমাত্র পথ হল আলী ও ইবনে আব্বাসের (রাঃ) পথ। কিন্তু সুন্নাহ (মহানবীর তরীকা ও সিদ্ধান্ত) হল এর উপরে। আল্লাহর রসূল ﷺ কর্তৃক এ কথা প্রমাণিত আছে যে, সুবাইআহ্ আসলামিয়্যাহ -তাঁর স্বামীর মৃত্যুর কয়েক দিন পর সন্তান প্রসব করলেন। আল্লাহর রসূল ﷺ তাঁকে পুনর্বিবাহ করার অনুমতি দিলেন[৭]

এর অর্থ এই দাঁড়াল যে, আমরা সূরাহ ত্বালাকের আয়াত ঃ ﴿وأولات الأحمال﴾কে আমাদের সঠিক সিদ্ধান্ত বলে মেনে নেব; যে সূরাহকে সূরাহ 'আন-নিসাউস সুগরা' বা ছোট সূরাহ নিসা বলা হয়ে থাকে। আর আমি একীন ও দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে এ কথা জানি যে, সুন্নাহর উক্ত দলীল যদি আলী ও ইবনে আব্বাসের ﷺ নিকট পৌঁছত, তাহলে তা অবশ্য অবশ্যই গ্রহণ করতেন এবং উক্ত মত পোষণ করতেন।

দ্বিতীয় উদাহরণ

এমন হতে পারে যে, (মতভেদকারী আলেম বা ইমামের) নিকট হাদীস তো পৌঁছেছে, কিন্তু তিনি তার বর্ণনাকারীকে যথার্থ নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত বলে মনে করেন না এবং ধারণা করেন যে, ঐ বর্ণনাকারী অপেক্ষাকৃত বেশী নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীর বিরোধী। তখন তিনি তাঁর নিকটে যে দলীলকে অধিক বলিষ্ঠ বলে মনে করেন, সেটাকেই গ্রহণ করেন।

আমরা এখানে মতানৈক্যের যে উদাহরণ পেশ করব, তা সাহাবাবর্গের পরবর্তীকালের কারো নয়। বরং সাহাবাগণের মাঝেই উক্ত শ্রেণীর মতভেদ দেখা গেছে। ফাতেমা বিন্তে কয়েসকে তাঁর স্বামী তিন তালাক দিলেন, স্বামীর প্রতিনিধি তাঁর নিকট যব পাঠালে (তা কম ও অযথেষ্ট মনে করে) তিনি তা নিতে অস্বীকার করলেন। মহানবী ﷺ-এর নিকটে তাঁদের

---

(৬) অর্থাৎ উক্ত বিধান এক দিক থেকে যেমন সাধারণ, তেমনি অন্য এক দিক থেকে তা বিশেষ। ৪ মাস ১০ দিনের ইদ্দত হল সকল মহিলার জন্য সাধারণ। কিন্তু গর্ভকালব্যাপী ইদ্দত গর্ভবতীর জন্য বিশেষ।

[৭] *(বুখারী, মিশকাত ৩৩২৮ নং)*

মোকদ্দমা পেশ হলে তিনি ফাতেমার জন্য এই ফায়সালা দিলেন যে, তাঁর জন্য কোন খোরপোশ ও বাসস্থান নেই। *(মুসলিম, মিশকাত ৩৩২৪ নং)* কারণ, তাঁর ইদ্দতকালই শেষ হয়ে গিয়েছিল। আর ইদ্দতকাল পার হয়ে গেলে তালাকপ্রাপ্তা মহিলার জন্য খোরপোশ ও বাসস্থানের দায়িত্ব স্বামীর উপর থাকে না। তবে যদি মহিলা গর্ভবতী হয়, তাহলে খোরপোশ দিতে হয়। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَإِن كُنَّ أُولَٰتِ حَمۡلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيۡهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّ ﴾

অর্থাৎ, তারা (স্ত্রীরা) গর্ভবতী হয়ে থাকলে -সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত তাদের জন্য ব্যয় করবে। *(সূরাহ ত্বালাক্ব ৬ আয়াত)*

উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর কত বড় মর্যাদা ও ইল্‌ম ছিল। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও উক্ত সুন্নাহ তাঁর অজানা ছিল। আর সে জন্যই তিনি মনে করতেন যে, উক্ত প্রকার তালাকপ্রাপ্তার জন্যও খোরপোশ ও বাসস্থান আছে। তিনি এই সম্ভাবনা ও আশঙ্কায় ফাতেমার হাদীসকে রদ্দ করে দিলেন যে, তিনি (ফাতেমা) হয়তো ভুলে গেছেন। এ জন্যই তিনি বললেন, 'আমরা কি একজন মহিলার কথা শুনে আমাদের প্রতিপালকের কথাকে বর্জন করব? জানি না, সে (সঠিকভাবে) মনে রেখেছে, নাকি ভুলে গেছে।

এর অর্থ এই যে, আমীরুল মু'মেনীন উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) উক্ত দলীলের ব্যাপারে সন্তুষ্ট ছিলেন না। আর এই শ্রেণীর আচরণ যেমন উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর দ্বারা ঘটেছে, তেমনই তাঁর থেকে নিম্নমানের সাহাবা এবং তাঁদের চেয়ে নিম্নমানের তাবেঈন দ্বারা ঘটতে পারে। বরং তাঁদের পরবর্তীকালের তাবে'-তাবেঈন দ্বারাও এমন আচরণ ঘটতে পারে। তদনুরূপ আজ পর্যন্ত -বরং কিয়ামত পর্যন্ত এমন হতে পারে যে, আলেম দলীল পেয়েও তার শুদ্ধতার ব্যাপারে ভরসা রাখতে সন্দেহ পোষণ করবেন। আমরা উলামাদের কত কথা পড়ে ও শুনে থাকি, যাতে এমন বহু হাদীস থাকে, যেগুলিকে কিছু উলামা সহীহ ও শুদ্ধ মনে করে তা গ্রহণ করেন এবং সেই অনুযায়ী বিধান দিয়ে থাকেন। পক্ষান্তরে অন্যান্য উলামাগণ সেগুলিকে যয়ীফ বা দুর্বল মনে করেন। ফলে তাঁরা তা গ্রহণ করেন না এবং সে অনুযায়ী বিধান দেন না। কারণ, সেগুলি যে আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) থেকে বর্ণিত, সে ব্যাপারে তাঁরা বিশ্বাস ও ভরসা রাখতে পারেন না।

মতানৈক্যের দ্বিতীয় কারণ

হাদীস ইমামের কাছে পৌঁছেছে, কিন্তু তিনি তা ভুলে গেছেন। (মানুষ মাত্রই ভুলে থাকে) একমাত্র মহান আল্লাহই ভুলেন না। *(সূরাহ ত্বা-হা ৫২ আয়াত)* কত মানুষ হাদীস ভুলে যায়; বরং আয়াতও ভুলে যেতে পারে।

একদা খোদ আল্লাহর রসূল ﷺ সাহাবাদেরকে নিয়ে নামায পড়লেন। তিনি ভুল করে একটি আয়াত ছেড়ে দিলেন। তাঁর সাথে (ঐ জামাআতে) (হাফেয ও ক্বারী সাহাবী) উবাই বিন কা'ব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ছিলেন। নামায থেকে ফারেগ হয়ে তিনি তাঁকে বললেন, "তুমি আমাকে তা স্মরণ করিয়ে দিলে না কেন?"[৮]

যাঁর উপর অহী অবতীর্ণ হত, যাঁর উদ্দেশ্যে মহান প্রতিপালক বলেছেন,

﴿ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰٓ ۝٦ إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُۚ إِنَّهُۥ يَعْلَمُ ٱلْجَهْرَ وَمَا يَخْفَىٰ ۝٧ ﴾

অর্থাৎ, অচিরেই আমি তোমাকে পাঠ করাব, ফলে তুমি বিস্মৃত হবে না - আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত। নিশ্চয় তিনি জানেন ব্যক্ত ও গুপ্ত বিষয়। *(সূরাহ আ'লা ৬-৭ আয়াত)*

(ফলকথা, মহানবী ﷺও ভুলে যেতেন। কারণ, তিনিও মানুষ ছিলেন।)

হাদীস পৌঁছনোর পর মানুষ ভুলে যায় -তার আরো একটি দৃষ্টান্ত উমার বিন খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ও আম্মার বিন ইয়াসের (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর কাহিনী। আল্লাহর রসূল ﷺ কোন প্রয়োজনে উভয়কে কোথাও পাঠিয়েছিলেন। সফরে উমার ও আম্মার উভয়েই (স্বপ্নদোষ হওয়ার ফলে) অপবিত্র হয়ে যান। (পানি ছিল না কাছে।) আম্মার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নিজ ইজতিহাদে স্থির করলেন যে, পানি যেমন দেহকে পবিত্র করে, তেমনি মাটিও করবে। ফলে তিনি পশুর মাটিতে গড়াগড়ি দেওয়ার মত গড়াগড়ি দিলেন। কারণ, তিনি সর্ব শরীরে মাটি লাগানো জরুরী মনে করলেন, যেমন সারা শরীরকে পানি দিয়ে ধোয়া ওয়াজেব। সুতরাং তিনি ঐভাবে পবিত্রতা অর্জন করে নামায আদায় করলেন। পক্ষান্তরে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নামাযই পড়লেন না। অতঃপর যখন তাঁরা রসূল ﷺ-এর নিকট এসে উপস্থিত হলেন, তখন (ঘটনা জেনে) তিনি

[৮] *(আবূ দাঊদ ৯০৭-৯০৮নং)*

তাঁদেরকে সঠিক সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলেন। আম্মার -কে বললেন, "তুমি তোমার হাত দ্বারা এইরূপ করলেই যথেষ্ট হত।" -এই বলে তিনি নিজের উভয় হাতকে মাটিতে একবার মারলেন। অতঃপর (তাতে ফুঁক দিয়ে) উভয় হাত দ্বারা চেহারা মাসাহ করলেন। তারপর বাম হাতের চেটো দ্বারা ডান হাতের এবং ডান হাতের চেটো দ্বারা বাম হাতের চেটো মাসাহ করলেন।[৯]

আম্মার উমার -এর খেলাফত কালে এবং তার পূর্বেও উক্ত হাদীস বর্ণনা করতেন। কিন্তু উমার একদা তাঁকে ডেকে প্রশ্ন করে বললেন, 'এটি কোন্ হাদীস, যা তুমি বয়ান করছ?' আম্মার ঘটনা বিবৃত করে বললেন, 'আপনার কি মনে পড়ে না? একদা আল্লাহর রসূল আমাদেরকে কোন প্রয়োজনে সফরে পাঠালেন। সেখানে আমরা নাপাক হয়ে গেলে (পানি না থাকার ফলে) আপনি নামায পড়লেন না। আর আমি মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে (পবিত্রতা অর্জন করে নামায পড়লাম।) ফিরে এলে নবী আমাকে বললেন, "তুমি তোমার হাত দ্বারা এইরূপ করলেই যথেষ্ট হত।"

কিন্তু উমার -এর সে কথা স্মরণ হল না। তিনি আম্মার -কে বললেন, 'আল্লাহকে ভয় কর, হে আম্মার!' আম্মার বললেন, 'আপনার আনুগত্য আল্লাহ আমার উপর ওয়াজেব করেছেন, সুতরাং আপনি যদি চান যে, আমি এ হাদীস বর্ণনা করব না, তাহলে করব না।' কিন্তু উমার বললেন, 'তুমি যে পথ অবলম্বন করে চলেছ, সেই পথেই আমি তোমাকে ফিরিয়ে দেব।' অর্থাৎ তুমি ঐ হাদীস লোকদেরকে বয়ান কর।

বলা বাহুল্য, খলীফা উমার এ কথা ভুলে গিয়েছিলেন যে, ছোট অপবিত্রতার অবস্থার মত বড় অপবিত্রতার ক্ষেত্রেও মহানবী তায়াম্মুম বিধিবদ্ধ করেছেন।

শুধু উমার -ই নন, বরং আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ -ও এ ব্যাপারে তাঁরই অনুগামী। সুতরাং তাঁর ও আবূ মূসা -এর মাঝে এ নিয়ে একটি বিতর্ক হয়। আবূ মূসা আম্মার উমার কে যে কথা বলেছিলেন সেই কথাই তাঁর নিকট উপস্থাপন করেন। কিন্তু ইবনে মাসঊদ বলেন, 'দেখ না, উমার তো আম্মারের কথায় সন্তুষ্ট হননি।' আবূ মূসা তাঁকে বললেন, 'আম্মারের কথা ছাড়, এখন (সূরাহ মায়েদার) এই (তায়াম্মুমের) আয়াত সম্পর্কে তুমি কি বল?' এরপর ইবনে মাসঊদ আর উত্তর করেননি।

---

[৯] *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত ৫২৮ নং)*

পক্ষান্তরে এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এ ব্যাপারে হকপন্থী হলেন সেই সংখ্যাগরিষ্ঠ দল, যাঁরা বলেন, যে নাপাকীতে গোসল ফরয হয়, (অসুবিধার ক্ষেত্রে) সেই (বড়) নাপাকীতেও তায়াম্মুম করা যাবে; যেমন যে নাপাকীতে গোসল ফরয নয়, সেই (ছোট) নাপাকীতে তায়াম্মুম করা যায়।

যাই হোক, আমাদের বলার উদ্দেশ্য হল যে, মানুষ ভুলে গিয়ে শরীয়তের কোন কোন হুকুম (শরয়ী বিধান) বা মাসআলার সঠিক সমাধান প্রসঙ্গে অনবগত থাকতে পারে এবং এমন বিপরীত সমাধান দিতে পারে, যে ব্যাপারে তার ওজর গ্রহণ করা যাবে। কিন্তু যে ব্যক্তি দলীল জানতে পারবে, সে ব্যক্তির ওজর গ্রহণযোগ্য নয়।

এই হল মতভেদ সৃষ্টির দু'টি কারণ।

মতানৈক্যের তৃতীয় কারণ

মতানৈক্যের তৃতীয় কারণ এই যে, দলীল তো ইমামের কাছে পৌঁছেছে, কিন্তু তার অর্থ ও ব্যাখ্যা তিনি ভুল বুঝে থাকেন। এর উপর দু'টি উদাহরণ পেশ করব। প্রথমটি কুরআন মাজীদ এবং দ্বিতীয়টি হাদীস শরীফ থেকে :

প্রথম উদাহরণ ঃ

মহান আল্লাহ কুরআন কারীমে বলেন,

﴿ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآئِطِ أَوْ لَـٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوا۟ مَآءً فَتَيَمَّمُوا۟ صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾

অর্থাৎ, আর যদি তোমরা অসুস্থ হও, অথবা সফরে থাক, অথবা তোমাদের মধ্যে কেউ পায়খানা থেকে আসে, অথবা তোমরা স্ত্রী স্পর্শ কর এবং পানি না পাও, তাহলে পবিত্র মাটি অন্বেষণ কর। *(সূরাহ নিসা ৪৩ আয়াত, সূরাহ মায়েদাহ ৬ আয়াত)*

উক্ত আয়াতে 'স্ত্রী-স্পর্শ' কথাটি নিয়ে উলামাগণ মতভেদ করেছেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ সাধারণ ছোঁয়াকে বুঝেছেন। কেউ কেউ বুঝেছেন সেই স্পর্শকে, যে স্পর্শে যৌন-উত্তেজনা থাকে। পক্ষান্তরে অন্য অনেকে বুঝেছেন যে, 'স্ত্রী-স্পর্শ' বলে 'স্ত্রী-সঙ্গম'-এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর এই শেষোক্ত মত হল ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) -এর।

পরন্তু আপনি যদি আয়াতটি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করেন, তাহলে এ কথা উপলব্ধ হবে যে, সঠিকতা রয়েছে তাঁদের সাথে, যাঁরা 'স্ত্রী-স্পর্শ' মানে 'স্ত্রী-সঙ্গম' মনে করেন। কারণ, মহান আল্লাহ পানি দ্বারা দুই প্রকার পবিত্রতা অর্জনের কথা উল্লেখ করেছেন; ছোট নাপাকী থেকে পবিত্রতা এবং বড় নাপাকী থেকে পবিত্রতা। ছোট নাপাকী থেকে পবিত্রতা অর্জনের ব্যাপারে বলেছেন,

﴿ فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾

অর্থাৎ, ---তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হস্তসমূহ কনুই পর্যন্ত ধৌত কর এবং তোমাদের মস্তকসমূহ মাসাহ কর। আর পদসমূহ গ্রন্থি পর্যন্ত ধৌত কর। *(সূরাহ মাইদাহ ৬ আয়াত)*

আর বড় নাপাকীর থেকে পবিত্রতা লাভের ব্যাপারে বলেছেন,

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوْا﴾

অর্থাৎ, যদি তোমরা অপবিত্র থাক, তবে পবিত্র হও।

সুতরাং এখানে কুরআনী বর্ণনা ও ভাষা অলঙ্কারের দাবী এই ছিল যে, (মাটি দ্বারা) তায়াম্মুম করে পবিত্রতা অর্জনের ক্ষেত্রেও উভয় প্রকার নাপাকীর কারণ উল্লেখ করা হবে। অতএব মহান আল্লাহর এই বাণী ঃ

﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَائِطِ﴾

(অর্থাৎ, কিংবা তোমাদের মধ্যে কেউ পায়খানা থেকে আসে।) ছোট নাপাকীর কারণের প্রতি ইঙ্গিত করে। আর ঃ

﴿أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾

(অর্থাৎ, অথবা স্ত্রী স্পর্শ কর) বড় নাপাকীর কারণের প্রতি ইঙ্গিত করে। কিন্তু এখানে আমরা যদি 'স্ত্রী-স্পর্শ'-এর অর্থ কেবল তার দেহ ছোঁয়া করি, তাহলে উক্ত আয়াতে ছোট নাপাকীর দুটি কারণের উল্লেখ হবে এবং বড় নাপাকীর কোন কারণ উল্লেখ হবে না। আর এটা কুরআনের অলঙ্কারময় বাচনভঙ্গির পরিপন্থী।

মোট কথা, যাঁরা 'স্ত্রী-স্পর্শ' মানে সাধারণ 'ছোঁয়া' মনে করেন, তাঁদের

মতে কোন পুরুষ যখন যৌন-উত্তেজনার সাথে সরাসরি কোন মহিলার দেহ স্পর্শ করবে, তখন তার ওযূ ভেঙ্গে যাবে এবং যৌন-উত্তেজনার সাথে স্পর্শ না হলে ওযূ ভাঙ্গবে না। অথচ সঠিক সিদ্ধান্ত হল এই যে, উত্তেজনার সাথে হোক অথবা এমনিই হোক মহিলাকে স্পর্শ করলে ওযূ ভাঙ্গে না। বর্ণিত আছে যে, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ তাঁর কোন স্ত্রীকে চুম্বন দিলেন। অতঃপর ওযূ না করে নামাযের জন্য বের হয়ে গেলেন। এ হাদীসটি একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে; যার এক সূত্র অপর সূত্রকে সুদৃঢ় করে।[১০]

এই শ্রেণীর মতভেদের দ্বিতীয় উদাহরণ ঃ

খন্দকের যুদ্ধ শেষে আল্লাহর রসূল ﷺ যখন ঘরে ফিরে এলেন এবং যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম রাখলেন, তখন জিবরীল ﷵ এসে তাঁকে বললেন, 'আমরা এখনো অস্ত্র রাখিনি। অতএব আপনি (চুক্তি ভঙ্গকারী বিশ্বাসঘাতক ইয়াহুদী সম্প্রদায়) বনী কুরাইযার উদ্দেশ্যে বের হন। সুতরাং আল্লাহর রসূল ﷺ সাহাবাবর্গকে বের হতে আদেশ দিয়ে বললেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ যেন বনী কুরাইযাহ ছাড়া অন্য স্থানে আসরের নামায না পড়ে।"[১১]

মহানবী ﷺ-এর এই আদেশ বুঝতে সাহাবাগণ মতভেদ করলেন। একদল সাহাবা বুঝলেন, রসূল ﷺ-এর উদ্দেশ্য হল, আমরা যেন এত শীঘ্র বের হয়ে যাই, যাতে বনী কুরাইযাহতে পৌঁছেই আসরের সময় হয়। (উদ্দেশ্য বনী কুরাইযাহতে আসরের নামায আদায় নয়।) সুতরাং শীঘ্রতা সত্ত্বেও যখন পথিমধ্যেই আসরের সময় হয়ে গেল, তখন তাঁরা পথেই নামায পড়ে নিলেন এবং যথাসময় অতিক্রম হতে দিলেন না।

পক্ষান্তরে অন্য দল বুঝলেন, রসূল ﷺ-এর উদ্দেশ্য হল, তাঁরা যেন বনী কুরাইযাতে পৌঁছেই আসরের নামায আদায় করেন। (এবং অন্য কোথাও নামায না পড়েন।) সুতরাং তাঁরা যথাসময় পার করে বনী কুরাইযাতে পৌঁছেই আসরের নামায আদায় করলেন।

আর এতে কোন সন্দেহ নেই যে, যাঁরা যথাসময়ে নামায আদায় করেছিলেন, তাঁদের সিদ্ধান্তই ছিল সঠিক। কারণ, যথাসময়ে নামায আদায় করার ব্যাপারে নির্দেশগুলি 'মুহকাম' (স্পষ্ট অর্থবোধক)। পক্ষান্তরে উক্ত নির্দেশ ছিল 'মুশ্‌তাবাহ' (দ্ব্যর্থবোধক)।

মুদ্দা কথা, মতানৈক্যের অন্যতম কারণ এই যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের উক্তি থেকে যা উদ্দেশ্য নয়, তা বুঝে আমল করা। আর এটি হল

---

[১০] *(আবূ দাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, মিশকাত ৩২৩ নং)*

[১১] *(বুখারী ৯৪৬ নং, মুসলিম)*

মতভেদের তৃতীয় কারণ।

মতানৈক্যের চতুর্থ কারণ

এমন হতে পারে যে, ইমামের কাছে হাদীস তো পৌঁছেছে, কিন্তু সে হাদীসটি মনসূখ (রহিত)। আর নাসেখ (রহিতকারী পরবর্তী হাদীস) তিনি জানেন না। ফলে ঐ হাদীস তাঁর নিকটে সহীহ হয় এবং হাদীসের উদ্দেশ্যও উপলব্ধ হয়, কিন্তু আসলে তা মনসূখ। অথচ সে প্রসঙ্গে তাঁর ইল্‌ম থাকে না। তাই এ ক্ষেত্রে তাঁর ওজর গ্রহণযোগ্য হবে। কারণ, মূলতঃ (সহীহ সূত্রে) নাসেখ না জানা পর্যন্ত কোন উক্তিকে মনসূখ বলা যায় না।

এই শ্রেণীর মতভেদ হল ইবনে মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর। রুকূ অবস্থায় নামাযী তার হাত দুটিকে কোথায় রাখবে? ইসলামের শুরুতে উক্ত অবস্থায় দুই হাতকে একত্রিত করে নামাযীর নিজ উভয় হাঁটুর মাঝে রাখা বিধেয় ছিল। কিন্তু পরবর্তী কালে তা রহিত হয়ে যায়। তখন হাত দু'টিকে হাঁটুর উপর রাখা (হাঁটু ধারণ করা) বিধেয় হয়। সহীহ বুখারী ইত্যাদি হাদীস গ্রন্থে রহিত হওয়ার কথা (শুদ্ধভাবে) প্রমাণিত রয়েছে। ইবনে মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) উক্ত রহিত হওয়ার কথা জানতেন না। ফলে তিনি হাত দু'টিকে তাঁর হাঁটুদ্বয়ের মাঝে একত্রিত রেখেই রুকূ করতেন। একদা তিনি আলকামা ও আসওয়াদের পাশে দাঁড়িয়ে নামায পড়লেন। তিনি দেখলেন, তাঁরা তাঁদের হাত হাঁটুর উপর রেখেছেন। তিনি তাঁদেরকে ঐভাবে হাত রাখতে নিষেধ করলেন এবং দুই হাঁটুর মাঝে হাত রাখতে আদেশ করলেন। তার কারণ কি? কারণ, তিনি যে আমল করেন তা যে মনসূখ -তা জানতেন না। আর কোন মানুষকে তার সাধ্যের বাইরে বোঝা বহনের দায়িত্ব দেওয়া হয় না। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ﴾

অর্থাৎ, আল্লাহ কাউকে তার ক্ষমতা বহির্ভূত দায়িত্ব দেন না। যে ভালো কাজ করবে সে নিজেই তার সুফল ভোগ করবে এবং যে মন্দ কাজ করবে সেও নিজে তার কুফল ভোগ করবে। *(সূরাহ বাক্বারাহ ২৮৬ নং)*

মতানৈক্যের পঞ্চম কারণ

ইমামের নিকট দলীল তো পৌঁছেছে। কিন্তু তিনি মনে করেন যে, উক্ত দলীল অপেক্ষাকৃত বলিষ্ঠ দলীল, স্পষ্ট উক্তি বা ইজমা'র পরিপন্থী। এই শ্রেণীর কারণ-ঘটিত মতভেদ আয়েম্মায়ে কেরামগণের উক্তিসমূহে

পরিলক্ষিত হয়। আমরা বহু উলামাকে ইজমা' (সর্ববাদি-সম্মতি) বর্ণনা করতে দেখি। কিন্তু বিচার-বিবেচনার পর দেখা যায় যে, আসলে তা ইজমা' নয়।

অতি আশ্চর্যজনক বর্ণিত ইজমা'র একটি এই যে, কিছু উলামা বলেছেন, 'ক্রীতদাসের সাক্ষ্য গ্রহণের ব্যাপারে (সকলের একমত) ইজমা' আছে।' পক্ষান্তরে অন্যান্য উলামাগণ বলেছেন, 'এ ব্যাপারে (সকলের একমত) ইজমা' আছে যে, ক্রীতদাসের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়!' এটা এক আশ্চর্যজনক বর্ণনা। কারণ, কিছু লোক মনে করে, তাদের আশপাশের লোকেরা কোন বিষয়ে একমত হলে, তাদের আর কেউ বিরোধী নেই। কেননা, তারা এই বিশ্বাস রাখে যে, উক্ত বিষয়ে সর্ববাদিসম্মত রায় কুরআন বা সুন্নাহর স্পষ্ট উক্তির অনুসারী। সুতরাং তখন তাদের মগজে দুই শ্রেণীর দলীল এসে জমা হয়; নস্ (স্পষ্ট উক্তি) ও ইজমা'। আবার কখনো কখনো তারা ঐ অভিমতকে সঠিক কিয়াস (অনুমিতি) ও সুচিন্তিত মতের অনুকূল ভাবে। যার দরুন এই সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে যে, এ ব্যাপারে কোন মতবিরোধ নেই এবং তাদের ঐ কল্পিত নস্ (স্পষ্ট উক্তি) ও তৎসঙ্গে সহীহ কিয়াসের বিরোধী কেউ নেই। পক্ষান্তরে ব্যাপারটা থাকে তার উল্টো।

এই শ্রেণীর মতানৈক্যের জন্য আমরা ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর 'রিবাল ফায্ল' (বেশী নেওয়ার সূদ) সংক্রান্ত অভিমতকে উদাহরণস্বরূপ উপস্থাপন করতে পারি।

আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে প্রমাণিত যে, তিনি বলেছেন, "সূদ তো কেবল বাকিতেই হয়ে থাকে।"[১২] পরন্তু উবাদাহ বিন সামেত (রাযিয়াল্লাহু আনহু) প্রমুখ সাহাবা কর্তৃক এ কথা বর্ণিত ও প্রমাণিত যে, সূদ বাকি রাখলেও হয় এবং (নগদে) বেশী নিলেও হয়।[১৩]

পক্ষান্তরে ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর পরবর্তীকালের উলামাগণ এ ব্যাপারে একমত যে, সূদ হল দুই প্রকার; (নগদে একই শ্রেণীর জিনিসের বিনিময়কালে) বেশী নেওয়ার সূদ এবং বাকী রাখার সূদ। কিন্তু ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) কেবল বাকি রাখার সূদকেই সূদ বলে স্বীকার করতেন। উদাহরণস্বরূপ, যদি আপনি ২ কিলো (সাধারণ) গমের বিনিময়ে ১ কিলো (বীজ) গম নগদ-নগদ হাতে-হাতে কেনা-বেচা বা বিনিময় করেন, তাহলে

---

[১২] *(বুখারী; মুসলিম, মিশকাত ২৮২৪ নং)*
[১৩] *(দেখুন, মিশকাত ২৮০৮-২৮১৪ নং)*

ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর নিকটে এ ব্যবসা ও লেনদেন (সূদী কারবার নয়, বিধায় এতে) কোন ক্ষতি হয় না। কারণ, তিনি কেবল বাকী রাখাতেই সূদ হয় বলে মনে করেন।

তদনুরূপ যদি আপনি ২০ গ্রাম (নতুন) সোনার বিনিময়ে ১০ গ্রাম (পুরাতন) সোনা (নগদ-নগদ) ক্রয়-বিক্রয় করেন, তাহলে এ কারবার তাঁর নিকট সূদ নয়। পক্ষান্তরে যদি আপনি আমাকে ১০ গ্রাম সোনা দেন, আর আমি তার বিনিময় পৃথক হওয়ার পর দেরী করে আপনাকে দিই, তাহলে তা সূদ।

আসলে তিনি হাদীসে ব্যবহৃত 'শুধুমাত্র' বা 'কেবল' শব্দ দেখে মনে করেন যে, সূদ অন্যভাবে হতে পারে না। আর এ কথা বিদিত যে, উক্ত শব্দ সীমাবদ্ধতা বুঝাতে ব্যবহার করা হয়। (অতএব সূদ কেবল বাকী রাখাতেই সীমাবদ্ধ) এবং তা এ কথারই দলীল যে, এ ছাড়া অন্য কারবার সূদী নয়।

কিন্তু বাস্তব ও সত্য হল উবাদাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীসে বর্ণিত সিদ্ধান্ত। আর তা এই যে, (নগদে) বেশী নেওয়া-দেওয়াও সূদ। কেননা, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেন, "যে ব্যক্তি বেশী দিল অথবা নিল, সে সূদী কারবার করল।"[১৪]

তাহলে ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যে হাদীসকে ভিত্তি করে তাঁর ঐ রায় ব্যক্ত করেছেন, সেই হাদীস পালন করার ব্যাপারে আমাদের অবস্থান কোথায়? আমাদের অবস্থান এই হবে যে, আমরা ঐ হাদীসের এমন ব্যাখ্যা করব, যাতে সেই হাদীসের সাথে সমন্বয় সাধন করা সম্ভব হয়, যে হাদীসে নির্দেশ রয়েছে যে, (বাকী না রেখে নগদে) বেশী নিলে-দিলেও সূদ হয়। যেমন আমরা বলব, 'যে নিকৃষ্ট সূদ জাহেলী যুগের লোকেরা ভক্ষণ করত এবং যার জন্য কুরআন মাজীদে মহান আল্লাহর এই বাণী অবতীর্ণ হল,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضْعَٰفًا مُّضَٰعَفَةً ﴾

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সূদ গ্রহণ কর না। *(সূরাহ আ-লে ইমরান ১৩০ আয়াত)* তা কেবলমাত্র বাকী রাখার সূদ। পক্ষান্তরে (হাতে-হাতে একই শ্রেণীর বস্তুর) বেশী নেওয়া-দেওয়ার সূদ বৃহৎ নিকৃষ্ট নয়। যার জন্য ইবনুল কাইয়েম (রঃ) তাঁর 'এ'লামুল মুআক্কেঈন' নামক গ্রন্থে এই মত পোষণ করেন যে, (নগদে) বেশী নেওয়া-দেওয়ার সূদ আসলে (ঐ নিকৃষ্টতম) সূদের ছিদ্রপথ বন্ধ করার লক্ষ্যে হারাম করা হয়েছে। অভীষ্ট লক্ষ্যরূপে ঐ সূদ হারাম করা হয়নি।

---

[১৪] *(মুসলিম, মিশকাত ২৮০৯ নং)*

মতানৈক্যের ষষ্ঠ কারণ

মতভেদের ষষ্ঠ কারণ হল, দুর্বল বা যয়ীফ হাদীসকে ভিত্তি করে আলেম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। অথবা হাদীস থেকে তাঁর দলীল গ্রহণের সূত্র দুর্বল থাকে। আর এই শ্রেণীর মতভেদ খুব বেশী।

দুর্বল হাদীসকে ভিত্তি করে মতভেদ সৃষ্টি হওয়ার একটি উদাহরণ 'সালাতুত তাসবীহ।' এ নামায কিছু উলামার নিকট মুস্তাহাব। এর পদ্ধতি হল এই যে, চার রাকআত নামাযে নামাযী সূরাহ ফাতিহা পাঠ করবে এবং তারপর ১৫ বার তাসবীহ পড়বে। অনরূপ রুকূ ও সিজদায় (১০ বার) তাসবীহ পাঠ করবে---। এইভাবে শেষ রাকআত পর্যন্ত যে নিয়ম-পদ্ধতি আছে, যার বর্ণনা আমি সঠিকভাবে দিতে পারছি না। কারণ, উক্ত নামাযের হাদীসকে শরীয়তের হাদীস বলে আমার বিশ্বাস হয় না।

অন্যান্য উলামাগণ মনে করেন যে, 'সালাতুত তাসবীহ' নামায অপছন্দনীয় বিদআত এবং তার হাদীস সহীহ নয়। এঁদের মধ্যে একজন হলেন ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রঃ)। তিনি বলেছেন, 'নবী ﷺ থেকে এ হাদীস সহীহ সূত্রে বর্ণিত নয়।'

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ বলেন, 'উক্ত নামাযের হাদীসটি আল্লাহর রসূল ﷺ -এর প্রতি আরোপিত মিথ্যা।'

প্রকৃতপ্রস্তাবে যে ব্যক্তি এ নামাযটি (হাদীসটি) নিয়ে বিচার-বিবেচনা করবে, সে দেখতে পাবে যে, এতে রয়েছে একাধিক উদ্ভট্টি। এমনকি নামাযটি বিধিবদ্ধ হওয়ার ব্যাপারেও উদ্ভট্টি লক্ষণীয়। কেননা, ইবাদত হয় হৃদয়ের জন্য উপকারী হবে। আর তা হলে ঐ ইবাদত সর্বকাল ও সর্বস্থানের জন্য বিধিবদ্ধ হবে। নচেৎ তা উপকারী হবে না। আর তা হলে তা বিধিবদ্ধই নয়। বলা বাহুল্য, উক্ত হাদীসে যে নামাযের কথা বলা হয়েছে যে, তা প্রত্যেক দিন অথবা প্রত্যেক সপ্তাহ অথবা প্রত্যেক মাস অথবা প্রত্যেক বছরে একবার। আর তা না পারলে জীবনেও একবার পড়বে -এমন কথার নযীর শরীয়তে মিলে না। সুতরাং উক্ত হাদীসটি তার সনদ ও মতন (বর্ণনা-সূত্র ও বক্তব্য) উভয় দিক দিয়েই যে উদ্ভট, তা স্পষ্ট হয়। আর যিনি হাদীসটিকে মিথ্যা বলেছেন -যেমন শায়খুল ইসলাম বলেছেন -তিনি ঠিকই বলেছেন। এ জন্য শায়খুল ইসলাম আরো বলেছেন, 'ইমামগণের কেউই এই নামাযকে মুস্তাহাব মনে করেননি।'

এখানে 'সালাতুত তাসবীহ' দিয়ে উদাহরণ দেওয়ার একমাত্র কারণ এই যে, নারী-পুরুষ অনেকেই এ নিয়ে প্রশ্ন করে থাকে। যাতে আমার ভয় হয় যে, এই নামাযের বিদআতটি বিধেয় বিষয়ে পরিণত হয়ে যাবে। আর যদিও কিছু মানুষের নিকট ভারী, তবুও আমি এই নামাযকে বিদআত এই কারণে বলছি যে, আমরা বিশ্বাস করি, মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যে যে কোন ইবাদতের বর্ণনা কিতাব অথবা তাঁর রসূলের (সহীহ) সুন্নায় না থাকলে তা বিদআত। (১৫)

তদনুরূপ দলীল গ্রহণে দুর্বলতার কারণে মতভেদ হয়। দলীল বলিষ্ঠ। কিন্তু তার প্রয়োগ-প্রণালী দুর্বল। যেমন কিছু উলামা "ভ্রূণের যবেহ, তার মায়ের যবেহ"[১৬] হাদীসকে কেন্দ্র করে এই শ্রেণীর মতভেদ করেছেন।

আহলে ইল্‌মগণের নিকট উক্ত হাদীসের অর্থ প্রসিদ্ধ এই যে, গাভিন পশুকে যবেহ করলে ঐ যবেহই ভ্রূণের জন্যও যথেষ্ট। অর্থাৎ, পৃথক করে তার যবেহর প্রয়োজন আর থাকে না। অবশ্য মায়ের যবেহর পর ভ্রূণ যদি জীবিত অবস্থায় বের হয়, তাহলে তাকে পৃথকভাবে যবেহ করতে হবে। অন্যথায় যদি মৃত বের হয়, তাহলে মৃত্যুর পর তাকে যবেহ করে কোন লাভ নেই।

পক্ষান্তরে কিছু উলামা উক্ত হাদীসের অর্থ বুঝেছেন যে, "ভ্রূণের যবেহ তার মায়ের যবেহর মত।" অর্থাৎ মায়ের মতই ভ্রূণেরও উভয় শাহরগ (ঘাড়ের প্রধান রক্তশিরা) কেটে রক্ত বহাতে হবে। কিন্তু এমন সমঝ সঠিকতা থেকে বহু ক্রোশ দূরে। আর এ দূরত্বের কারণ এই যে, মৃত্যুর পর রক্ত বহানো সম্ভব নয়। পরন্তু আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যার রক্ত বহানো হবে এবং তার উপর আল্লাহর নাম উল্লেখ করা হবে, তা ভক্ষণ কর।"[১৭]

আর এ কথা বিদিত যে, মৃত্যুর পর কোন পশুর রক্ত বহানো সম্ভব নয়।

([১৫]) প্রকাশ থাকে যে, অনুরূপ এর উদাহরণ হল শবেবরাতের রোযা ও নামায। যা কোন সহীহ হাদীসে আসে নি, বিধায় তা বিদআত।

[১৬] *(আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, দারেমী, মিশকাত ৪০৯১-৪০৯৩ নং)*

[১৭] *(আহমাদ, বুখারী, মুসলিম, সুনান আরবাআহ, সহীহুল জামে' ৫৫৬৫ নং)*

আমাদের কর্তব্য

প্রকৃতপক্ষে এ হল মতভেদের কয়েকটি কারণ, যার প্রতি সতর্ক করার ইচ্ছা আমি পোষণ করেছিলাম। যদিচও এর কারণ অসংখ্য এবং এমন সমুদ্রের মত, যার কোন কুল-কিনারা নেই।

কিন্তু এত সব কিছুর পর আমাদের অবস্থান কোথায় হওয়া উচিত? আমি বক্তব্যের শুরুতেই বলেছি যে, শোনা, পড়া ও দেখার বিভিন্ন প্রচার-মাধ্যমে তার বক্তা তথা বিভিন্ন উলামার মতভেদের কথা জেনে লোকেরা সন্দেহ ও দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে গেছে। তারা যেন বলছে, 'আমরা কার অনুসরণ করব? (কার কথা মানব?)'

'অসংখ্য হরিণ দেখে গোলক-ধাঁধায় পড়ে,
না জানে শিকারী কোন্‌টিরে শিকার করে।'

এ মত সংকট-মুহূর্তে আমরা বলতে পারি যে, যখন এমন কোন উলামাগণের আপোসে মতভেদের কথা শুনব, যাঁদেরকে ইল্‌ম ও দ্বীনদারীতে বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য বলে জানি, (তখন তাঁদের সঠিক সিদ্ধান্ত কে গ্রহণ করার প্রয়াস চালাব।) পক্ষান্তরে যাঁরা আহলে ইল্‌মদের দলভুক্ত নন, তাঁদের মতানৈক্যে আমরা কোন প্রকার গুরুত্ব দেব না। কারণ, আমরা তাঁদেরকে উলামা বলে গণ্য করি না এবং তাঁদের উক্তিকে আহলে ইলমদের উক্তির মত সংরক্ষণীয় বলে বিবেচনা করি না। কিন্তু 'উলামা' (ও আহলে ইল্‌ম) বলতে আমরা তাঁদেরকে বুঝাতে চাচ্ছি, যাঁরা মুসলিম উম্মাহ, ইসলাম ও ইলমের জন্য হিতাকাঙ্ক্ষিতায় প্রসিদ্ধ। এমন (গণ্যমান্য) উলামাদের মতানৈক্যের সময় আমাদেরকে দুইভাবে চিন্তা করে আমাদের অবস্থানক্ষেত্র নির্ধারণ করতে হবে ঃ-

প্রথমতঃ ঐ ইমামগণ কিতাব ও সুন্নাহর বিপরীত মত কেন গ্রহণ করলেন?

অবশ্য এ প্রশ্নের জবাব পূর্বে উল্লেখিত মতভেদের কারণসমূহে পাওয়া যেতে পারে। তাছাড়া আরো অন্য কোন কারণ হতেও পারে, যা আমরা উল্লেখ করিনি। কেননা, মতভেদের আরো অন্যান্য বহু কারণ আছে; খুব বড় আলেম না হলেও সে সব কারণ অনেকের কাছে স্পষ্ট।

দ্বিতীয়তঃ তাঁদের অনুসরণ করার ব্যাপারে আমাদের অবস্থান ও কর্তব্য কি? উলামাগণের মধ্যে আমরা কার অনুসরণ করে চলব? আমরা কি কেবলমাত্র একজন ইমামের কথার অনুসারী হব এবং সঠিকতা অন্যের কাছে থাকলেও কি মযহাবধারী অন্ধ অনুকরণকারীদের মত তাঁর কোন কথাকেই বর্জন করব না? নাকি আমাদের নিকট দলীল দ্বারা যে কথা

বলিষ্ঠ, সেই কথারই অনুসরণ করব -যদিও তা মুকাল্লেদ (মযহাব-পন্থীদের কারো মতের বিরোধী হয় তবুও?

জবাব হল (শেষোক্ত) দ্বিতীয়টি। সুতরাং যে ব্যক্তি দলীল জানে, তার জন্য ওয়াজেব হল দলীলের অনুসরণ করা -যদিও তা কোন কোন ইমামের মতের পরিপন্থী হয় এবং যতক্ষণ না উম্মতের ইজমা' (সর্ববাদিসম্মতি) -এর খেলাপ না হয়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এই বিশ্বাস রাখে যে, আল্লাহর রসূল ﷺ ছাড়া আর কারো কথা সর্বাবস্থায় সব সময়ের জন্য হ্যাঁ-না যেমনই হোক মানা ওয়াজেব, সে ব্যক্তি অরসূলকে রিসালতের বৈশিষ্ট্যে ভূষিত করে। অথচ বাস্তব এই যে, আল্লাহর রসূল ﷺ ব্যতীত অন্য সকলের কথা গ্রহণীয় হতে পারে অথবা বর্জনীয়।

অবশ্য এখানেও বিষয়টি বিবেচনাধীন থেকে যাচ্ছে। কারণ, আমরা এখনও ঘূর্ণায়মান অবস্থায় থেকে যাচ্ছি যে, (দলীল তো মানব, কিন্তু) কে এই দলীল থেকে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবেন? (কে তিনি, যিনি সহীহ দলীলের ভিত্তিতে সঠিক অভিমত ব্যক্ত করে থাকেন এবং আমরা তাঁর কথা মেনে নিতে পারব?)

প্রকৃতপ্রস্তাবে এটি একটি সমস্যা। কেননা, প্রত্যেক আলেমের দাবী হল, আমিই তিনি। আসলে এ দাবী কিন্তু ঠিক নয়। যে ব্যক্তিই দলীল উপস্থাপন করতে জানে, তার জন্যই (ইজতিহাদের) দরজা খুলে দেওয়া উচিত নয় - যদিও সে হয়তো বা ঐ দলীলের সঠিক মানে-মতলব বুঝে না। আমরা তাকে বলব, 'আপনি মুজতাহিদ। আপনি যা ইচ্ছা তাই বলবেন। কিন্তু এতে শরীয়ত তথা মনুষ্য-সমাজে বিপর্যয় সৃষ্টি হবে।

বলা বাহুল্য, এ ব্যাপারে মানুষ তিন ভাগে বিভক্ত ঃ-

১। আলেম, যাঁকে আল্লাহ ইল্‌ম ও সমঝ দান করেছেন।

২। তালেবে-ইল্‌ম (ইল্‌ম-সন্ধানী), তাঁর ইল্‌ম আছে, কিন্তু তিনি ঐ বড় আলেমের দর্জায় পৌঁছেননি।

৩। সাধারণ মানুষ, যাঁর কোন (শরয়ী) ইল্‌ম নেই। (যদিও তিনি অন্য কোন বিষয়ে একজন ডক্টর অথবা কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক, চিন্তাবিদ বা বড় সাংবাদিক।)

প্রথম শ্রেণীর মানুষের ইজতিহাদ করে বলার অধিকার আছে। বরং তাঁর জন্য সহীহ দলীল-ভিত্তিক কথা বলা ওয়াজেব; তাতে অন্যান্য যে কোন মানুষ তার বিপরীত বলুক না কেন (অথবা বিরোধিতা করুক না কেন)। কারণ, তিনি এ ব্যাপারে শরীয়তের আদেশপ্রাপ্ত।

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنۢبِطُونَهُۥ مِنْهُمْ ﴾

অর্থাৎ, (যখন তাদের নিকট কোন শান্তি বা ভীতিপ্রদ বিষয় আসে, তখন তারা রটনা করতে থাকে। অথচ যদি তারা এটা রসূলের প্রতি ও তাদের কর্তৃপক্ষদের কাছে উপস্থিত করত, তাহলে) তাদের মধ্যে তত্ত্বানুসন্ধানীগণ তা অবশ্যই বুঝতে পারত। *(সূরাহ নিসা ৮৩ আয়াত)*

বলা বাহুল্য তিনি হলেন 'আহলে ইস্তিনবাত্ব' বা তত্ত্বানুসন্ধানীদের একজন, যাঁরা আল্লাহ ও তদীয় রসূলের বাণী কি নির্দেশ করে, তা জানেন।

দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষ, যাঁকে আল্লাহ ইল্ম দান করেছেন। কিন্তু তিনি প্রথম শ্রেণীর দর্জায় পৌঁছতে সক্ষম হননি। এমন শ্রেণীর মানুষ যদি শরীয়তের ব্যাপক ও সাধারণ এবং তাঁর নিকট যে ইল্ম পৌঁছে তদ্দ্বারা ফায়সালা দিয়ে থাকেন -তাহলে তা তাঁর জন্য দোষাবহ নয়। তবে তাঁর পক্ষে জরুরী এই যে, তিনি এ ব্যাপারে খুবই সতর্কতা অবলম্বন করবেন এবং তাঁর থেকে বড় আলেমকে জিজ্ঞাসা করে নিতে কুণ্ঠিত হবেন না। কারণ, তিনি ভুল বুঝতে পারেন। কখনো বা তাঁর ইল্ম ও সমঝ ব্যাপককে সীমাবদ্ধ, সাধারণকে নির্দিষ্ট অথবা রহিত আদেশকে বহাল মনে করতে পারেন। অথচ তিনি এ ব্যাপারে কোন টেরই পাবেন না।

পক্ষান্তরে তৃতীয় শ্রেণীর মানুষ, যাঁদের নিকট শরীয়তের ইল্ম নেই, তাঁদের জন্য আহলে ইল্মকে জিজ্ঞাসা করে নেওয়া ওয়াজেব। কারণ, মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ فَسْـَٔلُوٓا۟ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝٧ ﴾

অর্থাৎ, যদি তোমরা না জান, তাহলে বিজ্ঞগণকে জিজ্ঞাসা করে নাও। *(সূরাহ আম্বিয়া ৭ আয়াত)*

অন্য এক আয়াতে আছে,

﴿ فَسْـَٔلُوٓا۟ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝٤٣ بِٱلْبَيِّنَٰتِ وَٱلزُّبُرِ ﴾

অর্থাৎ, যদি তোমরা না জান, তাহলে বিজ্ঞগণকে জিজ্ঞাসা করে নাও দলীল-প্রমাণ ও গ্রন্থসহ। *(সূরাহ নাহল ৪৩-৪৪ আয়াত)*

সুতরাং এই শ্রেণীর মানুষের কর্তব্য হল জিজ্ঞাসা করা। কিন্তু জিজ্ঞাসা করবে কাকে? দেশে তো বহু উলামা আছেন। যাঁদের প্রত্যেকের দাবী, তিনি একজন (বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ) আলেম। অথবা তাঁদের প্রত্যেকের

ব্যাপারে লোকে বলে, আলেম। তাহলে কাকে জিজ্ঞাসা করা হবে?

আমরা কি এ কথা বলব যে, আপনার জন্য ওয়াজেব হল, আপনি সন্ধান নিয়ে দেখবেন, তাঁদের মধ্যে কার কথা অধিকতর সঠিক হতে পারে। সুতরাং তাঁকেই জিজ্ঞাসা করে তাঁর সিদ্ধান্ত মোতাবেক আমল করবেন।

নাকি আমরা বলব যে, যাঁদেরকে আপনি উলামা বলে মনে করেন তাঁদের মধ্যে যাঁকে ইচ্ছা তাঁকেই জিজ্ঞাসা করেন। আর বাস্তব এই যে, কখনো কখনো ইল্‌মের কোন বিশেষ মাসআলায় (সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে ছোট আলেম) কৃতকার্য হয়ে যান। পক্ষান্তরে তাঁর থেকে বড় আলেম সে ব্যাপারে সফলতা অর্জন করতে পারেন না।

বলা বাহুল্য, কাকে জিজ্ঞাসা করবেন -এ নিয়ে উলামাদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন, সাধারণ মানুষের জন্য তার নিজ দেশের (স্থানীয়) উলামাগণের মধ্যে সবচেয়ে যাঁকে বড় ও নির্ভরযোগ্য আলেম বলে মনে করা হয় -তাঁকে জিজ্ঞাসা করা ওয়াজেব। কারণ, মানুষ যখন রোগাক্রান্ত হয়, তখন সে নিরাময়ের জন্য এমন ডাক্তার খোঁজে, যিনি ডাক্তারী-বিদ্যায় সব চাইতে বেশী পারদর্শী। অনুরূপ শরয়ী প্রশ্নের ক্ষেত্রেও একই কথা বলা যায়। কারণ, ইল্‌ম হল হৃদয় (রোগের) ওষুধ। সুতরাং যেমন আপনি আপনার রোগ দূর করার জন্য সবচেয়ে বড় ডাক্তার খোঁজ করে তাঁর নিকট চিকিৎসা করেন, তেমনিই এখানে আপনার জন্য ওয়াজেব হল, যাঁকে আপনি সব চাইতে বড় আলেম মনে করেন -তাঁকেই শরীয়তের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করার জন্য বেছে নেবেন। কারণ, উক্ত উভয়ের মাঝে কোন পার্থক্য নেই।

পক্ষান্তরে কেউ কেউ মনে করেন, এমন খোঁজ করা তাঁর জন্য ওয়াজেব নয়। কেননা, এমনও হতে পারে যে, যিনি সব চাইতে বড় আলেম তিনি নির্দিষ্ট প্রত্যেক মাসআলায় সব চাইতে বড় নন। এ কথার সমর্থনে দলীল এই যে, সাহাবা ﷵ-দের যামানায় লোকেরা বড় থাকা সত্ত্বেও ছোটকে দ্বীনী বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করত।

এ ব্যাপারে আমার মত এই যে, মুসলিম যে আলেমকে তাঁর দ্বীনদারী (পরহেযগারী) ও ইল্‌মে সবার থেকে শ্রেষ্ঠ মনে করবে, তাঁকেই দ্বীনী মাসায়েল জিজ্ঞাসা করবে। তবে এটা ওয়াজেব মনে করে নয়। কারণ, সবার চাইতে যিনি শ্রেষ্ঠ, তিনি এই নির্দিষ্ট মাসআলায় ভুলও করতে পারেন এবং যিনি তাঁর চাইতে ছোট তিনি এ বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত দিতে পারেন। সুতরাং উত্তম হল এই যে, দ্বীনী বিষয়ে মুসলিম তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে, যিনি হবেন তাঁর ইল্‌ম, পরহেযগারী ও দ্বীনদারীর জন্য সঠিকতার

অধিকতর নিকটবর্তী। (১৮)

পরিশিষ্ট

পরিশেষে আমি নিজেকে প্রথমে, তারপর আমার মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দকে - বিশেষ করে আলেম সমাজকে- এই উপদেশ দান করি যে, ইল্‌মী মাসায়েল সম্পর্কিত কোন সমস্যা মানুষের নিকট উপস্থিত হলে (সিদ্ধান্ত দিতে) কেউ যেন তাড়াহুড়া ও জলদিবাজী না করেন। বরং সে বিষয়ে বিচার-বিবেচনা করে নিশ্চিত জ্ঞান লাভ না করা পর্যন্ত কোন অভিমত ব্যক্ত করা উচিত নয়। যাতে আল্লাহ সম্পর্কে কেউ বিনা ইল্‌মে কথা না বলে বসেন। মুফতী হলেন আল্লাহ ও মানুষের মাঝে এক প্রকার মাধ্যম। যিনি আল্লাহর শরীয়ত মানুষের মাঝে প্রচার করে থাকেন। যেমন আল্লাহর রসূল ﷺ থেকে এ কথা প্রমাণিত, তিনি বলেছেন যে, "উলামা হল আম্বিয়ার ওয়ারেস।"[১৯]

তিনি আরো বলেছেন যে, কাযী (সমাধান, সিদ্ধান্ত ও মীমাংসাদাতা বিচারক) হল ৩ প্রকার। এদের মধ্যে একজন মাত্র কাযী বেহেশতে যাবে। আর সে হল সেই কাযী; যে হক জেনে হক বিচার করে।"[২০]

তদনুরূপ একটি গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ এই যে, যখন আপনি কোন শরয়ী সমস্যার সম্মুখীন হবেন, তখন আল্লাহর সাথে আপনার হৃদয় সংযোগ করুন এবং তাঁর প্রতি একান্ত মুখাপেক্ষী হয়ে এই চান যে, তিনি যেন আপনাকে সমঝ ও ইল্‌ম দান করেন। বিশেষ করে বড় বড় সমস্যার ক্ষেত্রে এমন করা উচিত, যার সমাধান বহু (আলেম) মানুষের অজানা থাকে।

আমাদের কিছু ওস্তায আমাদেরকে বলেছেন যে, যখন কোন আলেম কোন দ্বীনী সমস্যা (মাসআলার) ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবেন, তখন তাঁর উচিত, বেশী বেশী করে ইস্তিগফার করা। আর এ নির্দেশ তাঁরা মহান

([১৮]) সতর্কতার বিষয় যে, 'আদার বনে শিয়াল রাজা'কেই মহারাজা মেনে নিয়ে তাকেই কুতবুদ্দীন ও মুফতী মনে করা বসা উচিত নয়। ওয়াজেব হল, প্রকৃত আলেম খোঁজ করে তাঁকেই প্রকৃত মর্যাদা দিয়ে তাঁর ফতোয়া মত আমল করা। অনুবাদক

[১৯] *(আহমাদ, আবূ দাঊদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, দারেমী, মিশকাত ২১২নং)*

[২০] *(সুনান আরবাআহ, হাকেম প্রমুখ, সহীহুল জামে' ৪৪৪৬ নং)*

আল্লাহর এই বাণী থেকে গ্রহণ করেছেন, তিনি বলেন,

﴿ إِنَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَىٰكَ ٱللَّهُ ۚ وَلَا تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيمًا ﴿١٠٥﴾ وَٱسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٠٦﴾ ﴾

অর্থাৎ, নিশ্চয় আমি তোমার প্রতি সত্যসহ গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি, যেন তুমি সেই অনুযায়ী মানুষের মাঝে ফায়সালা কর, যা আল্লাহ তোমাকে হৃদয়ঙ্গম করান। তুমি বিশ্বাসঘাতকদের সপক্ষে বিতর্ককারী হয়ো না। আর আল্লাহর কাছে ইস্তিগফার কর। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াবান।

(সূরাহ নিসা ১০৫-১০৬ আয়াত)

কারণ অধিকাধিক ইস্তিগফার গোনাহ-মোচনের অনিবার্য কারণ, যে গোনাহ অজ্ঞতা সৃষ্টি ও ইল্‌ম বিস্মৃত হওয়ার অন্যতম কারণ। যেমন মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَٰقَهُمْ لَعَنَّٰهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَٰسِيَةً ۖ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِۦ ۙ وَنَسُوا۟ حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا۟ بِهِۦ ۚ ﴾

অর্থাৎ, তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের জন্য আমি তাদেরকে অভিসম্পাত করেছি ও তাদের হৃদয়কে কঠিন করে দিয়েছি। তারা শব্দগুলোর আসল অর্থ বিকৃত করে এবং তারা যে বিষয়ে উপদিষ্ট হয়েছিল, তার একাংশ ভুলে বসেছিল। *(সূরাহ মাইদাহ ১৩ আয়াত)*

ইমাম শাফেয়ী (রঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি কবিতা-ছন্দে এ কথা বলেছেন,

شكوت إلى وكيع سوء حفظي + فأرشـدني إلى ترك المعـاصي

وأخـبرني بأن العـلم نـورٌ + ونور الله لا يُهـدى لعـاصي

আমি আমার ওস্তাদ অকী'র নিকট আমার স্মৃতিশক্তি দুর্বল হওয়ার অভিযোগ করলাম। তিনি আমাকে পাপাচরণ পরিহার করতে নির্দেশ দিলেন এবং বললেন, 'জেনে রেখো, ইল্‌ম আল্লাহর তরফ হতে আসা (অনুগ্রহ বা)

নূর। আর আল্লাহর (অনুগ্রহ বা) নূর কোন পাপিষ্ঠকে দেওয়া হয় না।’[২১]

বলা বাহুল্য, নিঃসন্দেহে ইস্তিগফার এমন একটি কারণ, যার ফলে মহান আল্লাহ বান্দার জন্য সমঝ ও ইল্‌মের পথ সহজ করে দেন।

সবশেষে দুআ করি, যেন আল্লাহ সকলকে তওফীক ও সঠিকতা দান করেন। আমাদেরকে সুদৃঢ় বাক্য (কালেমা) দ্বারা দুনিয়া ও আখেরাতে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখেন। হেদায়াত-প্রাপ্তির পর আমাদের হৃদয়কে যেন বক্র না করেন। তাঁর নিকট থেকে আমাদেরকে করুণা দান করেন। নিশ্চয় তিনিই মহাদাতা।

والحمد لله رب العالمين أولا وأخيرا،

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

সমাপ্ত

“নানান মুনির নানান মত যে
মানবি বল সে কার শাসন?
কয় জনার বা রাখবি মন?
এক সমাজকে মানলে করবে
আরেক সমাজ নির্বাসন,
চারদিকে শৃঙ্খল বাঁধন।
সকল পথের লক্ষ্য যিনি
চোখ পুরে নে তাঁর আলোক
বিধির বিধান সত্য হোক।।”

[২১] *(আল জওয়াবুল কাফী ৫৪ পৃঃ)*

الخلاف بين العلماء أسبابه وموقفنا منه

(باللغة البنغالية)

تأليف : فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين (رحمه الله)

ترجمة : عبد الحميد الفيضي